কালের কণ্ঠ

আপডেট : ৮ অক্টোবর, ২০১৮ ২১:৪২

প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন পরিকল্পনা স্পষ্ট নয়

এ কে এম শাহনাওয়াজ

বাংলাদেশে নানা ক্ষেত্রে অগ্রগতি ঘটছে। তথ্য-উপাত্ত ছাড়াও যাপিত জীবনে আমরা অভিজ্ঞতা দিয়েই বুঝতে পারছি। এই অগ্রগতি অবধারিত ছিল। সভ্যতার আবর্তন রীতি অনুযায়ী এই উন্নয়ন ধারা অনুভব আর ফলভোগ করার কথা ছিল আরো অনেক আগেই। কিন্তু আমাদের রাজনৈতিক দর্শনের দুর্বলতা, স্বার্থপরতা ও দুর্নীতিগ্রস্ত প্রশাসন এবং পরিবেশ আমাদের অগ্রগতির পথ শ্লথ করে দিয়েছিল। বর্তমান সরকার এই ঘেরাটোপ থেকে নিজেদের কিছুটা মুক্ত রাখার চেষ্টা করেছে। দুর্নীতি মুক্তির তেমন পদক্ষেপ না নিলেও অর্থনৈতিক উন্নয়নের কিছু সাহসী পদক্ষেপ নেওয়ায় একটি পরিবর্তনের ছোঁয়া আমরা অনুভব করছি। আমরা অনেক সময় অনেক কেতাবি কথা বলি। কিন্তু এর প্রায়োগিক দিকটির প্রতি তেমন লক্ষ রাখি না। আর রাজনীতিকরা তো মঞ্চে বলার জন্য কিছু কথা রেখে দেন। মঞ্চের বাইরে বা ক্যামেরার পরে ওসবের বাস্তবায়ন নিয়ে তেমন ভাবনা থাকে না। গণমানুষের চোখে অঞ্জলি পরানোর দক্ষতা তো এ অঞ্চলের মানুষদের থাকেই।

এই যে শুনি সরকার শিক্ষা বিস্তারে নানা পদক্ষেপ নিচ্ছে, প্রাথমিক শিক্ষার কাঠামো, প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো ছড়িয়ে দিচ্ছে দেশজুড়ে, বিনা মূল্যে কোটি কোটি বই বিতরণ করছে, জেলায় জেলায় বিশ্ববিদ্যালয় গড়তে চাইছে। প্রাথমিকভাবে এসব পদক্ষেপ অভিনন্দনযোগ্য। তবে প্রশ্ন থেকে যায়, এগুলো কী মেধাবী পরিকল্পনা থেকে হচ্ছে, না রাজনৈতিক সুবিধা লাভের জন্য হয়েছে? প্রকৃত শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য কী পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে সেটি বড় কথা।

পাঁচ শতকের মাঝপর্বে মধ্যযুগের সভ্যতার যাত্রা শুরু হয়েছিল ইউরোপে। গ্রামকেন্দ্রিক একটি সামন্তসভ্যতা। এ সময়ের ইউরোপে প্রাথমিক শিক্ষার ধারাও তৈরি হয়নি। ৯ শতকে তৎকালীন গল–আধুনিক ফ্রান্সের রাজা শার্লামেন ভাবতে পেরেছিলেন শিক্ষার

আলো থাকা চাই। চারদিকে খ্রিস্ট ধর্মের বিস্তার ঘটছে। গির্জা তৈরি হচ্ছে। রাজা শার্লামেন কোনো রাজনৈতিক কুশলী বুদ্ধিতে নয়, নিজ বিবেচনা ও দায়বোধ থেকেই অনুভব করলেন অন্তত বাইবেল পড়ার জন্য হলেও গির্জার পাদ্রি ও সাধারণ খ্রিস্টানের প্রাথমিক শিক্ষার জ্ঞান থাকা চাই। এই বাস্তব প্রয়োজনে তিনি প্রথম গির্জাকেন্দ্রিক প্রাথমিক শিক্ষার যাত্রা শুরু করেছিলেন।

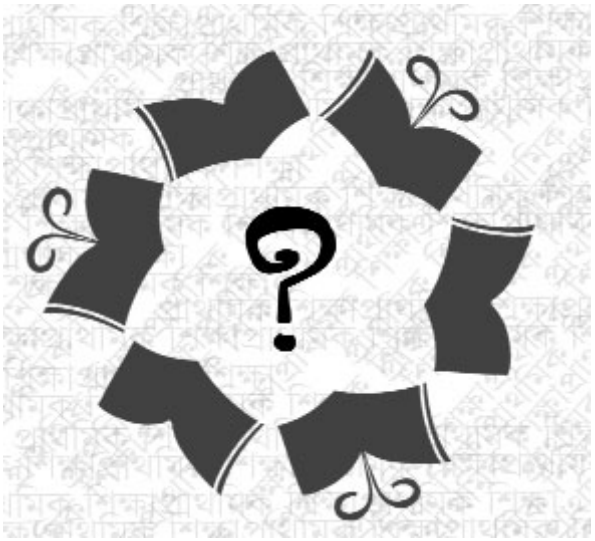

আমরা কেন যে বর্তমান সময়ের চাহিদা অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নের কথা না ভেবে শুধু শিক্ষার বিস্তার নিয়ে কথা বলছি, তা বোধগম্য নয়। পশ্চিম ইউরোপের নানা দেশে এবং যুক্তরাজ্যের নানা অংশের কাছ থেকে দেখেছি শিক্ষার সব স্তরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় প্রাথমিক শিক্ষাকে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো হয় সুদৃঢ় ও দৃষ্টিনন্দন অবকাঠামোর ওপর। প্রয়োজনীয় শিক্ষা সরঞ্জামে সুসজ্জিত থাকে। শিশু মনস্তত্ত্ব জানা সুশিক্ষিত মেধাবীরা শিক্ষক হন। শিক্ষার্থী স্কুলকে আনন্দময় স্থান মনে করে। শিক্ষক সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানে থাকেন। শিশুর সৃজনশীল মেধা বিকাশের জন্য আমাদের মতো অদ্ভুত সৃজনশীল প্রশ্নে আটকে রাখেন না। শিক্ষক সপ্তাহ অন্তর শিক্ষার্থীদের নিয়ে যান কাছের জাদুঘর বা কোনো দর্শনীয় জায়গায়। ফিরে এসে এর ওপর গল্প হয়। সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটানো হয় এভাবেই। সেখানে সুশিক্ষিত মেধাবীরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতায় আসেন। তাঁদের প্রণোদনাও আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের প্রায় সমান বেতন পান তাঁরা। মর্যাদাও প্রায় একই রকম। এসব দেশে বছরজুড়ে নানা নামের পরীক্ষায় বন্দি করা হয় না শিক্ষার্থীদের।

আমরা পরিবর্তন আনব কেমন করে? আমাদের শিক্ষা পরিকল্পনায় কখনো ভাবা হলো না প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর ভিত্তি শক্ত না হলে নড়বড়ে হয়ে যায় পরবর্তী শিক্ষাক্রমগুলো। নর্দান আয়ারল্যান্ডসের রাজধানী বেলফাস্টে অবস্থিত কুইন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞানের এক আমেরিকান প্রফেসর মিস কেরোলাইনের সঙ্গে আমার কথা হলো। তিনি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কারিকুলামের ওপর অনেক বই লিখে যথেষ্ট খ্যাতিমান। অনেক অ্যাওয়ার্ডও পেয়েছেন। আমাদের দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক স্কুল পর্যায়ের বই লিখলে অনেক সহকর্মীও নাক সিটকান। আর উন্নত দেশে প্রজ্ঞাবান অধ্যাপকরা স্কুলের বই লেখেন। এ জন্য তাঁদের সম্মানিত করা হয়।

কুইন্স বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশের এক মেধাবী মেয়ে স্কুল শিক্ষা ও কারিকুলাম নিয়ে গবেষণা করছেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিভাগের মেধাবী ছাত্রী ছিলেন। তিনি জানালেন, বাংলাদেশের কিছু অদ্ভুত নীতি এখানে সমালোচিত হয়। শিক্ষা কারিকুলাম নিয়ে নানা প্রজেক্টের ট্রেনিং প্রগ্রামে কখনো বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাজ্যে যাঁরা আসেন, তাঁদের মধ্যে সরাসরি পাঠদানে জড়িত এমন কাউকে সাধারণত দেখা যায় না। অথবা শিক্ষা কারিকুলাম নিয়ে যাঁরা কাজ করেন বা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তাঁদের ট্রেনিংয়ে আসার যৌক্তিকতা থাকলেও তাঁরা নির্বাচিত হন না। অথচ প্রধানত যাঁরা আসেন, তাঁদের বেশির ভাগ সরকারি আমলা, শিক্ষা বা ট্রেনিং প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা। শর্ত অনুয়ায়ী স্কুল কারিকুলামের ওপর তাঁদের ট্রেনিং শেষে গ্রন্থ লিখতে হয়। ইউরোপ ও বাংলাদেশের কারিকুলাম অভিন্ন নয়। মানেও অনেক তফাত আছে। দেশে শিক্ষকতায় যুক্ত না থাকায় এবং বাংলাদেশের শিক্ষার চলমান ধারার সঙ্গে যুক্ত না করে ইউরোপীয় মানের প্রভাবিত রূপ এসব গ্রন্থে থাকায় শেষ পর্যন্ত দেশে এর ব্যবহার আর হয় না। অর্থাৎ ট্রেনিং প্রগ্রামে বড় রকমের অর্থেরই অপচয় হয়ে থাকে। প্রসঙ্গক্রমে আরেকটি অভিজ্ঞতার কথা বলতে হয়। ইংল্যান্ডের ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষক দুঃখ করছিলেন। তিনি একসময় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার সহকর্মী ছিলেন। বললেন, এমনিতে এখন যুক্তরাজ্যে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার ব্যয় বেড়ে গেছে। স্কলারশিপের সুবিধা প্রায় নেই বললেই চলে। বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন মেধাবী শিক্ষকের যুক্তরাজ্যে পড়তে বা গবেষণার জন্য আসাটা কঠিন হয়ে পড়েছে। এই বাস্তবতায় মাঝেমধ্যে দেখা যায় সরকারি আমলারা আসছেন এমএস বা পিএইচডি করার জন্য। বঙ্গবন্ধু বৃত্তি নামে একটি বৃত্তি নাকি আছে দেশে। ২৭ লাখ টাকা পর্যন্ত নাকি দেওয়া হয়। এই বৃত্তি প্রায়ই শিক্ষকদের কপালে জুটে না। যাঁদের গবেষণাটা জরুরি ছিল। শিক্ষার সঙ্গে অনেক দিন যুক্ত না থাকায় বৃত্তিভোগকারী আমলাদের অনেকে সাফল্যও দেখাতে পারেন না। বিষয়টি নিয়ে ওখানকার শিক্ষকরা মাঝেমধ্যেই আমার সাবেক সহকর্মীর কাছে প্রশ্ন তোলেন।

এসব উদাহরণ থেকে আমাদের মনে হয়, শিক্ষার কোনো ক্ষেত্রেই আমাদের রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা নেই। এখন শুনছি জেলায় জেলায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হবে। ভূরি ভূরি শিক্ষিত বেকার বানানোর পরিকল্পনা কেন বুঝতে পারি না। বর্তমানে বহির্বিশ্বে এবং

দেশে কারিগরি বিদ্যায় শিক্ষিতদের প্রয়োজন। জেলায় জেলায় প্রতিষ্ঠা করতে হলে কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানই জরুরি ছিল। এ নিয়ে আমাদের নীতিনির্ধারকরা ভাবছেন কি না আমার জানা নেই।

প্রাথমিক শিক্ষা প্রসঙ্গেই ফিরে আসি। উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষার কথা বলা হয়। শুনেছি, চট্টগ্রাম-কক্সবাজারের বেশির ভাগ গ্রামে এখনো এ ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেনি। অন্যত্র কী অবস্থা আমি জানি না। আর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা মান্ধাতার আমলের ধারাতেই রয়ে গেছে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষিত মেধাবীদের প্রাইমারি বিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে আসার সুযোগ নেই। স্বল্প বেতনে প্রকৃত মেধাবীদের আকৃষ্ট করার সুযোগ থাকে না। বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কারিকুলামে এবং পঠন পদ্ধতিতে অনেক পরিবর্তন আনা হয়েছে। কিন্তু তা প্রকৃত অর্থে কার্যকর করার মতো দক্ষ শিক্ষকের অভাব রয়েছে দেশে। এই সত্যটি নীতিনির্ধারকদের কাছে গুরুত্ব পাচ্ছে বলে মনে হয় না। দু-একটি মডেল স্কুল দিয়ে সামগ্রিক অবস্থা চিত্রায়িত করা কঠিন।

প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে সবচেয়ে বড় বিষফোড়া অপ্রয়োজনীয় পরীক্ষার কঠিন চাপ। যেখানে পশ্চিমা বিশ্বে শিশু শিক্ষার আদর্শে পরীক্ষা কমিয়ে শূন্যের কোটায় আনার চেষ্টা, সেখানে আমরা পিইসি, জেএসসি–নানা নামের পরীক্ষার অক্টোপাসে আরো বেশি করে বেঁধে ফেলতে চাইছি আমাদের শিশুদের। এতে যে শিক্ষার্থীদের স্কুলে যাওয়া প্রীতিকর না হয়ে ভীতিকর হয়ে উঠছে, সেদিকে আমরা খেয়াল করছি না। আমরা কোন পরিকল্পনায় শিশুদের শিক্ষার্থী না বানিয়ে পরীক্ষার্থী বানিয়ে ফেলছি? ক্লাস ফাইভের ছেলে-মেয়েকে আজ বাল্যের উচ্ছ্বাস ভুলে কোচিং করতে হচ্ছে। শিক্ষার্থী-শিক্ষক উভয়ে গলদঘর্ম হচ্ছেন ‘সৃজনশীল’ মেধা বিকাশে। আর ভুল পথ নির্দেশনায় সৃজনশীলতা বিকাশের বদলে গাইডনির্ভর করে তুলেছেন। বাংলাবাজারের গাইড বইয়ের এক সজ্জন প্রকাশক হাসতে হাসতে বলেছিলেন, ‘সৃজনশীলের’ কথা শুনে মনে হয়েছিল তাঁদের বুঝি বাণিজ্য বন্ধ হবে। এখন দেখছেন নতুন বাণিজ্যের পথ খুলে গেছে। দীর্ঘদিন শিশু শিক্ষার ওপর কাজ করা কুইন্স ইউনিভার্সিটির মিস কেরোলাইন বুঝতে পারছিলেন না আমাদের শিশুদের এত সব পরীক্ষা দিতে হয় কেন!

আমি বুঝতে পারি না প্রাথমিক শিক্ষায় এত গোলমেলে অবস্থা কেন আমাদের দেশে? তাহলে কি যথাযোগ্য মানুষরা নীতিনির্ধারণে ভূমিকা রাখতে পারেন না? দেশে তো অর্থনৈতিক অগ্রগতি হচ্ছে। তবে শিক্ষার প্রথম ধাপটিকে অর্থাৎ ভিত্তিটিকে সুদৃঢ় করার বিবেচনা কেন করতে পারছেন না পরিকল্পকরা। কেন আকর্ষণীয় বেতন কাঠামোর ভেতর রেখে মেধাবী স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারীদের আকৃষ্ট করতে পারছেন না প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক হওয়ার জন্য, প্রতিবেশী ভারত যা করতে পেরেছে অনেক আগেই। আমি পশ্চিমবঙ্গের অনেক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা দেখেছি যাঁরা পিএইচডি ডিগ্রিধারী। ব্যাংকের কর্মকর্তা হওয়ার চেয়ে স্কুলের শিক্ষক হওয়া অনেক বেশি আকর্ষণীয় তাঁদের কাছে। ভারসাম্যমূলক বেতন কাঠামো থাকায় স্কুল ও কলেজে শিক্ষকতার ফারাক দেখেন না তাঁরা। আমরা মনে করি, সবার আগে প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন নিয়ে ভাবতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন যোগ্য মানুষদের নিয়ে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করা এবং তা বাস্তবায়নের পথে হাঁটা।

লেখক : অধ্যাপক, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

shahnawaz7b@gmail.com

Print

সম্পাদক : ইমদাদুল হক মিলন,
নির্বাহী সম্পাদক : মোস্তফা কামাল,
ইস্ট ওয়েস্ট মিডিয়া গ্রুপ লিমিটেডের পক্ষে ময়নাল হোসেন চৌধুরী কর্তৃক প্লট-৩৭১/এ, ব্লক-ডি, বসুন্ধরা, বারিধারা থেকে প্রকাশিত এবং প্লট-সি/৫২, ব্লক-কে, বসুন্ধরা, খিলক্ষেত, বাড্ডা, ঢাকা-১২২৯ থেকে মুদ্রিত।
বার্তা ও সম্পাদকীয় বিভাগ : বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা, প্লট-৩৭১/এ, ব্লক-ডি, বারিধারা, ঢাকা-১২২৯। পিএবিএক্স : ০২৮৪০২৩৭২-৭৫, ফ্যাক্স : ৮৪০২৩৬৮-৯, বিজ্ঞাপন ফোন : ৮১৫৮০১২, ৮৪০২০৪৮, বিজ্ঞাপন ফ্যাক্স : ৮১৫৮৮৬২, ৮৪০২০৪৭। E-mail : info@kalerkantho.com